সরকারের সাথে সংলাপে বাসদ

মুক্তিযুদ্ধের মৌলচেতনা ও '৯০-এর গণ-আকাঙ্ক্ষাকে অস্বীকার করে দেশ পরিচালিত হওয়ায় জাতির জীবনে এ দুর্যোগ

ভ্যানগার্ড প্রতিবেদন

গত ৪ জুন সংলাপে অংশগ্রহণ করে বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ। দলের আহ্বায়ক কমরেড খালেকুজ্জামানের নেতৃত্বে ৭ সদস্যের প্রতিনিধি দলে ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী, কমরেড আবদুল্লাহ সরকার, কমরেড শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তী, কেন্দ্রীয় বর্ধিত ফোরামের সদস্য বজলুর রশীদ ফিরোজ, রাজেকুজ্জামান রতন ও সাইফুর রহমান তপন। সংলাপে দলের পক্ষ থেকে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন কমরেড খালেকুজ্জামান।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পক্ষে প্রধান উপদেষ্টা ড. ফখরুদ্দীন আহমদ-সহ উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য ড. হোসেন জিল্লুর রহমান, হাসান আরিফ, আনোয়ারুল ইকবাল, মেজর জেনারেল (অব.) গোলাম কাদের ও ইফতেখার আহমেদ চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, গত ১৪ মে ২০০৮ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় থেকে সচিব কাজী মো: আমিনুল ইসলাম স্বাক্ষরিত সংলাপে অংশগ্রহণের আমন্ত্রণপত্র বাসদের কাছে পাঠানো হয়। সরকারের পক্ষ থেকে সংলাপের বিবেচ্য বিষয়াদি সম্পর্কে নির্দেশিকা হিসেবে প্রধান উপদেষ্টার ভাষণের একটি প্রতিলিপি আমন্ত্রণপত্রের সাথে সংযুক্ত ছিল।

সংলাপে বাসদের পক্ষ থেকে উপস্থাপিত লিখিত বক্তব্য

শুরুতেই আমাদের দলকে সংলাপে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সম্মানিত প্রধান উপদেষ্টা ও উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্যদেরকে আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ইতোপূর্বে আমাদেরকে প্রাক-সংলাপ বৈঠকে ডাকা হয়েছিল। সময়ের স্বল্পতা সত্ত্বেও আমরা কতিপয় বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দিয়ে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছিলাম। আমরা আশা করি সে বিষয়গুলো আপনাদের নজরে রয়েছে। আজ যেহেতু সম্মানিত প্রধান উপদেষ্টার ১২ মে ২০০৮ জাতির উদ্দেশে দেয়া ভাষণকে আলোচনার ভরকেন্দ্র করা হয়েছে, তার ভিত্তিতে এবং বর্তমান পরিস্থিতির আলোকে আমরা আলোচনা করতে চাই।

জাতীয় সনদ/জাতীয় ঐকমত্য

এই সংলাপে প্রত্যাশা ব্যক্ত করা হয়েছে যে একটি জাতীয় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হবে যাতে সকল রাজনৈতিক দল, শ্রেণী-পেশার ও সর্বস্তরের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটবে এবং তার ভিত্তিতে একটি জাতীয় সনদ তৈরী হবে। এর আবশ্যকতার উপর বিশেষ জোর দেয়া হয়েছে। এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য হল; প্রথমত: বিগত ৩৭ বছর ধরে সর্বসাধারণের অর্থাৎ দেশের জনগণের আকাঙ্ক্ষার বিপরীতে দেশ শাসিত হয়েছে। এদেশে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হয়নি। সামরিক-অসামরিক স্বৈরশাসন চালিয়ে দেশে গণতন্ত্রের ভিতকে নস্যাৎ ও প্রশাসনসহ গণতন্ত্রের সকল অবকাঠামোকে দলীয়করণের দুষ্ট ছোবলে ধ্বংস করা হয়েছে। দুর্নীতি এবং দুর্বৃত্তায়ণের অভিযোগে বিগত দিনের শাসক দলসমূহের শীর্ষ নেতৃত্বের অনেকেই কারাবন্দি। এখন এই সকল দল এবং এর বিপরীতে যে সকল রাজনৈতিক শক্তি জনগণের স্বার্থ, জাতীয় স্বার্থ ও সার্বিক মুক্তির লক্ষ্যে কাজ করে এসেছে এবং এখনও করছে তাদের সবাইকে নিয়ে ভবিষ্যত রাষ্ট্র পরিচালনার নীতি পদ্ধতিগত প্রশ্নে একটা ঐকমত্য কিভাবে প্রতিষ্ঠা করা যাবে? একদিকে স্বাধীনতাবিরোধী যুদ্ধাপরাধী, স্বৈরাচার, দুর্নীতিগ্রস্ত-দুর্বৃত্তায়িত লুটপাটের রাজনীতি এবং অন্যদিকে প্রগতিশীল, গণতান্ত্রিক, দেশপ্রেমিক, নীতিনিষ্ঠ আদর্শবাদী রাজনৈতিক শক্তি – এ দু'য়ের মধ্যে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে কোন ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে – এটা আমাদের কাছে বোধগম্য নয়।

দ্বিতীয়ত: শ্রেণী-পেশাসহ সর্বস্তরের জনগণের আকাঙ্ক্ষার যে কথা বলা হয়েছে তার সর্বোচ্চ প্রতিফলন ঘটেছিল ১৯৭১ সালে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে এবং '৯০-এর সামরিক স্বৈরশাসনবিরোধী গণঅভ্যুত্থানের কালে। তাই জনস্বার্থে জাতীয় সনদ বা ঐকমত্য বলতে যা গ্রহণযোগ্য হতে পারে তা হলো মুক্তিযুদ্ধের মৌলচেতনা অর্থাৎ গণতান্ত্রিক শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ও সমাজগঠন এবং সাম্রাজ্যবাদের প্রভাবমুক্ত স্বাধীন জাতীয়

অর্থনীতির বিকাশসহ সার্বিক বিকাশ নিশ্চিত করা। পাশাপাশি সামরিক স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক, নারী, আইনজীবী, সাংবাদিক, সাংস্কৃতিক কর্মী, শিক্ষকসহ সর্বস্তরের মানুষের সম্মিলিতভাবে উত্থাপিত দাবি যা গণদাবি হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছিল তার বাস্তবায়ন করা। আমাদের বিবেচনায় '৭১-এর মৌলচেতনা ও '৯০-এর গণতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষা ও গণদাবিকে অস্বীকার করে তার বিপরীতে দেশ পরিচালিত হওয়ার পরিণতিতে আজ সমগ্র জাতি এক মহা দুর্যোগে পতিত হয়েছে এবং চরম দুঃসময় পার করছে। তাই আজ এ সংকট উত্তরণের লক্ষ্যে এ বিষয়কে ভরকেন্দ্র রেখে ভবিষ্যৎ রাষ্ট্র পরিচালনার নীতি নির্ধারিত হলে জাতীয় প্রত্যাশা পূরণে অনেক দূর পর্যন্ত অগ্রসর হওয়া সম্ভব।

'লেজুড় রাজনীতির' অপসংস্কৃতি

রাজনীতি একটা মহৎ বৃত্তি। তার সাথে 'লেজুড়' কথাটি যুক্ত করলে রাজনীতি সম্পর্কিত ধারণার বিকৃতি সাধন করা হয়। রাজনীতি বর্জিত মানুষ সমাজচেতনা বর্জিত মানুষ হয় বলে আমরা জানি। সমাজ চেতনা, জীবন দর্শন, রাষ্ট্র-সমাজ পরিচালনা, অন্যায়-অসত্য-অমঙ্গল ও শোষণ-নিপীড়ন বিরোধী সামাজিক প্রতিরোধ, সামাজিক রাজনৈতিক দার্শনিক পথনির্দেশ, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সবই রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে কার্যকর হয়। এর বাইরে ছাত্র, শিক্ষক, শ্রমিক, কৃষকসহ সমাজের কোনো অংশের মানুষেরই থাকা সঙ্গত নয়। এখন প্রশ্ন হল, আদর্শহীন লুটেরা বুর্জোয়া রাজনীতি এবং ওই সকল রাজনৈতিক দলের কুপ্রভাবে যখন মানুষ নষ্ট হয় তখন শাস্তি কি জনগণের প্রাপ্য? যারা রাজনীতিতে 'লেজুড়' থাকতে পারে মনে করেন তারাও মানবেন যে, হিংস্র প্রাণীর লেজে বিষ থাকে না, থাকে মাথায়, দাঁতে-নখে। এখন দুষ্ট রাজনীতির মাথা, শরীর, দাঁত-নখ সবই থাকবে শুধু লেজ খসিয়ে দেয়া হবে, তাতে দুষ্টপ্রভাব কি বিলুপ্ত হবে?

প্রধান উপদেষ্টা তার ভাষণে বলেছেন অধিকাংশ অঙ্গসংগঠন আদর্শহীন 'লেজুড় রাজনীতির' অপসংস্কৃতিতে নিমজ্জিত। এখন ওই সকল রাজনৈতিক দলকে সনাক্ত করে তাদের সাথে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করার প্রচার ও প্রয়াসের বদলে ছাত্র, শিক্ষক, শ্রমিকসহ বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার মানুষের সচেতন সংগ্রামী ঐক্য, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-প্রতিরোধের শক্তিকে দুর্বল করার এবং আদর্শবাদী রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন করার কোনো পদক্ষেপই গণতান্ত্রিক হতে পারে না, সভ্য অগ্রসর সমাজ নির্মাণের এবং গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি ও শাসন-প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলার সহায়ক হতে পারে না। তাই আদর্শবাদী রাজনীতি ও রাজনৈতিক দল বিচ্ছিন্নতা নয়, দুষ্ট রাজনীতি ও তার পৃষ্ঠপোষক রাজনৈতিক দলের সংশ্রবমুক্ত থাকাই সমাধান বলে আমরা মনে করি। এটা আইন করে হবে না, গণজাগরণ ও গণআন্দোলনের মাধ্যমে গণসচেতনতা সৃষ্টি করেই এটা করা সম্ভব। তা না করে উল্টো পথে হাঁটতে চাইলে আদর্শহীন অপশক্তি ভিন্নরূপে ঠিকই থাকবে – শুধু আদর্শের পতাকাবাহী বিভিন্ন স্তরে বিন্যস্ত শক্তি মার খাবে। এতে দুর্বৃত্তায়িত রাজনীতির চেহারা আরও প্রকট হবে।

দল নিবন্ধন

নির্বাচন কমিশন এবং সরকার উভয় পক্ষ থেকেই অতীতে সুষ্ঠু নির্বাচন ও গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক পরিবেশের অভাব ও দুর্নীতিগ্রস্ত দুর্বৃত্তায়িত রাজনীতির আধিপত্যের কথা বলা হয়েছে। জনগণকে কালোটাকা, সন্ত্রাসী বাহিনী, প্রলোভন-প্রতারণা, ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার ইত্যাদি নানা কায়দায় জিম্মি করা হয়েছিল। এ অবস্থায় সুস্থ, নীতিনিষ্ঠ, আদর্শের রাজনীতির প্রতি নির্বাচনের মাধ্যমে জনমতের সত্যিকার প্রতিফলন কঠিন ছিল। এখন সরকার এবং নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে বারবার রাজনীতির গুণগত উত্তরণের কথা বলা হচ্ছে। অথচ নিবন্ধনের জন্য যে সকল মানদণ্ড ও করণীয় নির্ধারণ করা হয়েছে তাতে ভিন্ন আদলে কিংবা স্বমূর্তিতে দুর্বৃত্তায়িত অতীত রাজনীতিকেই পুনর্বহালের সুযোগ করে দেয়া হয়েছে এবং গণসচেতনতার ভিত্তিতে গণরায় প্রকাশের জন্য জনগণের নিজস্ব শক্তি গড়ে তোলার সামনে দেয়াল খাড়া করানো হয়েছে। অতীতে জনগণ দুর্নীতিগ্রস্ত দুর্বৃত্তায়িত রাজনীতির কাছে জিম্মি ছিল, আর এখন জরুরী আইনের ঘেরাটোপে জিম্মি হয়ে পড়েছে। যুদ্ধাপরাধীদের নির্বাচনে অযোগ্য ঘোষণা করা হবে বলে বলা হচ্ছে, অথচ যুদ্ধাপরাধীদের সনাক্ত করে তার বিচার কার্যক্রম এখনও শুরুই করা হয়নি। এটা স্ববিরোধিতার নামান্তর। এখন দেখা যাচ্ছে দলের নিবন্ধন তার যথার্থ প্রয়োজন সীমা ছাড়িয়ে বাস্তবে নিয়ন্ত্রণের পর্যায়ে চলে যাচ্ছে। এখানে শঙ্কার দিক হল, এ ধরনের নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা ভবিষ্যৎ শাসকগোষ্ঠীর হাতে রাজনীতি ও রাজনৈতিক দলের কণ্ঠরোধের হাতিয়ারে পরিণত হবে।

রাজনৈতিক দলের সংস্কার

জনগণের সম্মিলিত ইচ্ছা ও অভিব্যক্তির প্রকাশ ঘটে রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে। সেই অর্থে রাজনৈতিক দল জনগণের ইচ্ছা ও স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে। যদিও শোষক-শোষিতে বিভক্ত সমাজে কোনো দল উভয় অংশের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে না। তারপরও আপেক্ষিক অর্থে জনগণের ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা ও স্বার্থকে ধারণ করে জনগণের পক্ষে লড়াই সংগ্রাম করতে করতেই একটা দল গণতান্ত্রিক চরিত্র এবং জনগণের কাছে দায়বদ্ধতা থেকে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি আয়ত্ত্ব করে। এখন কোনো দল যদি জনগণের নাম ভাঙিয়ে দেশী-বিদেশী লুটেরাগোষ্ঠীর স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করতে থাকে তাহলে সেই দলের গণতান্ত্রিক চরিত্র ও সংস্কৃতি নষ্ট হয়ে যায়। শুধু তাই নয়, এ সকল দলের প্রাধান্য যত প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে জনগণের মধ্যে গণতান্ত্রিক চেতনা, মূল্যবোধ ও সংস্কৃতিও সেই মাত্রায় লোপ পেতে থাকে। এ অবস্থায় এরা নীতি-আদর্শহীনতার সংকটে পড়ে দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত কালোটাকা ও পেশীশক্তি দিয়ে রাজনীতির নিয়ন্ত্রক হওয়ার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হয়। কর্মী-সমর্থকদের মাঝে যুক্তিবাদের বদলে অন্ধত্ব ও উগ্রতার চর্চা চলতে থাকে। শাসন-প্রশাসনের সকল ক্ষেত্রে দলীয়করণ ও দুর্বৃত্তায়াণের এক বেষ্টনী গড়ে ওঠে। এ পরিস্থিতিতে নির্বাচন জনমতের যথার্থ প্রতিফলন ঘটাতে ব্যর্থ হয়। ফলে ব্যাপক গণআয়তনে গণতান্ত্রিক চেতনা, মূল্যবোধ ও সংস্কৃতির জাগরণ ছাড়া কতিপয় নেতা-নেত্রীদের ছাঁটাই-বাছাই করে কিংবা একই চেতনাপুষ্ট লোকদের নানা শিবিরে বিন্যস্ত করে সংস্কার প্রচেষ্টা নিলে রাজনীতিকে দুর্বৃত্ত মুক্ত করা কিংবা রাজনৈতিক দলের প্রকৃত গণতন্ত্রায়ন হবে না। জরুরি অবস্থার রজ্জুতে জনগণকে বেঁধে রেখে জাতীয় জাগরণ এবং জনগণের প্রকৃত গণতান্ত্রিক শক্তির বিকাশ সম্ভব নয়। আর এটা না হলে গণতান্ত্রিক সংস্কারও সম্ভব নয়।

প্রতিযোগিতামূলক অর্থনীতি ও আমাদের উন্নয়ন

প্রধান উপদেষ্টার ভাষণে বলা হয়েছে, 'বর্তমান বিশ্ব অত্যন্ত প্রতিযোগিতামূলক এবং দ্রুত অগ্রসরমান। ফলে আমাদের রাজনৈতিক, প্রশাসনিক সকল কর্মকাণ্ডকে হতে হবে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সহায়ক'। বাস্তবে উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশসমূহ অর্থাৎ বৃহৎ সাত-আটটি সাম্রাজ্যবাদী শক্তি অনুন্নত বিশ্ব তথা সারাদুনিয়াকে লুটতরাজের অবাধ ক্ষেত্রে পরিণত করার নাম দিয়েছে তথাকথিত মুক্তবাজার প্রতিযোগিতা। অথচ সবাই জানে মুক্তবাজার ও বিশ্বায়নের প্রবক্তরা কিন্তু তাদের বাজার মুক্ত করে রাখেনি। এই সকল সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ইরাক, আফগানিস্থানের তেল ও খনিজ সম্পদ দখল করার জন্য যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষ হত্যা করে বিশ্বজনমত ও আন্তর্জাতিক রীতি-নীতি পদদলিত করে ওই সকল দেশ দখল করেছে। তারা যখন আমাদের দেশে এসে উন্নয়ন সহযোগী হিসাবে দাবি করে, ক্ষেত্র-বিশেষে খবরদারি করে এবং আমাদের শাসকগোষ্ঠী তা নির্বিবাদে মেনে নেয়, বিশেষ করে তাদের নিয়ন্ত্রিত আন্তর্জাতিক অর্থলগ্নীকারী সংস্থা বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ এবং এডিবি'র পরামর্শ এবং চাপ হজম করে জুতার মাপে পা বানানোর মতো করে বাংলাদেশের অর্থনীতিকে পরিচালিত করতে চায়, তখন আমরা কি একে প্রতিযোগিতা বলব না পরনির্ভরতা বলব? দেশের মধ্যে গত ৩৭ বছরে রাষ্ট্রীয় সম্পদ পানির দরে ব্যক্তিদের হাতে তুলে দিয়ে এবং গোটা বাজার ব্যবস্থা কতিপয় কর্পোরেট হাউজের হেফাজতে রেখে শত সহস্র কোটি টাকার মালিক ঋণখেলাপি, বিল খেলাপি ও সিন্ডিকেট চক্রের জন্ম দেয়া হয়েছে। দেশী-বিদেশী এই লুটেরা চক্র জাতীয় অর্থনীতির ভিত্তিকে দিনে দিনে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিয়েছে। একটা শক্তিশালী স্বাধীন জাতীয় অর্থনীতির ভিত মজবুত না করা গেলে প্রতিযোগিতা তো দূরের কথা টিকে থাকাই দুষ্কর। আদমজী-সহ পাটশিল্পের ধ্বংসযজ্ঞ এবং কাফকো-এশিয়া এনর্জি-সহ তেল-গ্যাস-কয়লা সম্পদ নিয়ে জাতীয় স্বার্থবিরোধী অসম চুক্তিসহ অনুৎপাদনশীল খাতওয়ারি প্রকল্প, ঋণ ও জনস্বার্থ-পরিপন্থী আর্থিক নীতি-কৌশল নির্ধারণ ইত্যাদি সব কিছু মিলে অতীত এবং তার ধারাবাহিকতা খেয়াল করলেই এ সত্য ধরা পড়বে।

আমাদের জনসম্পদ গড়ে তোলার জন্য অপরিহার্য যে শিক্ষা – তাকে দুর্মূল্য করে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকে বঞ্চিত রেখে কি করে বিশ্বমানের প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হওয়া যাবে তা বোঝা দুষ্কর। মরার ওপরে খাঁড়ার ঘা'য়ের মতো সংবিধান লঙ্ঘন করে এক ধারার শিক্ষার বদলে পরস্পরবিরোধী তিন ধারার শিক্ষা চাপিয়ে রেখে জনশক্তিকে জনসম্পদ হয়ে ওঠার পথকে আরও কঠিন করে রাখা হয়েছে। শ্রমিকশ্রেণীসহ উৎপাদক শ্রমজীবী সকল মানুষকে চরম আর্থিক দুরবস্থায় ফেলে মৌলিক মানবিক অধিকার, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ন্যায্যমজুরি, বিশ্রাম, বাসস্থান ইত্যাদি থেকে বঞ্চিত রেখে জাতীয় উন্নয়ন দুঃস্বপ্ন ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। পরাধীন আমলেও আমাদের দেশের শ্রমিকরা ৫ মন চালের সমান ন্যূনতম মজুরি পেত; এখন স্বাধীন দেশে দেড় মন চালের মজুরিও ভাগ্যে জোটে না। এসবের পরিবর্তন করে স্বাধীন জাতীয় অর্থনীতির ভিত মজবুত করেই শুধু প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ সম্ভব।

হরতাল, ধর্মঘট ইত্যাদি

ভাষণে প্রধান উপদেষ্টা ধ্বংসাত্মক রাজনীতি পরিত্যাগ করার কথা বলেছেন। হরতাল, অবরোধের চির-অবসানের কথা বলেছেন। প্রথম কথা হল, হরতাল ধর্মঘট অবরোধ ইত্যাদি গণতান্ত্রিক আন্দোলনের হাতিয়ার এবং গণতান্ত্রিক অধিকার। দীর্ঘদিনের লড়াই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে জনগণ এ অধিকার অর্জন করেছে। কিন্তু অতীতে ক্ষমতাসীন ও ক্ষমতাবহির্ভূত বৃহৎ বুর্জোয়া দলগুলো হরতাল অবরোধকে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার না করে তাদের ক্ষমতায় যাওয়া এবং ক্ষমতায় থাকার উন্মত্ত হানাহানিতে ব্যবহার করেছে – যার ফলে গণআন্দোলনের এ হাতিয়ারগুলো কার্যকর ও শক্তিশালী উপাদান হিসাবে হাজির হওয়ার পরিবর্তে নৈরাজ্যকর-হিংসাত্মক চেহারা নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে। যার পরিণতি দেশকে ১১ জানুয়ারি ২০০৭ এর দিকে ঠেলে দিয়েছিল। এখন এই দৃষ্টান্ত তুলে ধরে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণের পদক্ষেপ কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। কারণ সমাজে শোষণ, জুলুম, দুর্নীতি, দুঃশাসন সবই থাকছে। মালিক শ্রেণীর লে-অফ, লক-আউট, শ্রমিক ছাঁটাই ইত্যাদি অধিকার থাকছে অথচ জনগণের এবং শ্রমজীবী মানুষের সংঘবদ্ধ প্রতিবাদের অধিকার থাকবে না, যা শাসকগোষ্ঠী এবং মালিকশ্রেণীর হাতে জনগণকে শোষণ এবং পীড়নের সীমাহীন ক্ষমতা তুলে দেবে। শাসকদের জবাবদিহিতামূলক সতর্কতা অতি নিম্ন পর্যায়ে নেমে যাবে।

আমাদের দেশের অতীত সংগ্রামের বিশাল অধ্যায়ের আলোচনা না করেও সাম্প্রতিক ছোট দু'একটি ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। এখন দেশে গ্যাসের প্রচণ্ড সংকট। অথচ অতীতের সরকারগুলি এই গ্যাস রফতানির কথা জোরেশোরে প্রচারই নয়, বিবিয়ানা থেকে গ্যাস রফতানি প্রায় চূড়ান্ত করে ফেলেছিল। তখন তেল-গ্যাস-বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটির নেতৃত্বে বামপন্থিরা হরতাল, অবরোধ, লংমার্চের মাধ্যমে জনমত সংগঠিত করে সে গ্যাস রফতানি ঠেকিয়েছিল। সেদিন এ পদক্ষেপ না নিলে আজ কী ভয়াবহ গ্যাস সংকট তথা শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি, পরিবহন, গৃহস্থালীসহ সকল ক্ষেত্রে বাড়তি আর্থিক সংকটের মুখে দেশ পড়তো তা অনুমান করা কি কঠিন? একইভাবে সিমিটার নামক একটা বিদেশী জালিয়াত কোম্পানির হাত থেকে হরিপুর তেলক্ষেত্র রক্ষা, ভূয়া মার্কিন কোম্পানি এসএসএ'র হাত থেকে চট্টগ্রাম বন্দর রক্ষা, এশিয়া এনার্জির হাত থেকে ফুলবাড়ী কয়লা খনি এবং ফুলবাড়ীবাসীকে রক্ষা, পল্লী বিদ্যুতের অনিয়ম ও লুণ্ঠনের হাত থেকে শুধু এলাকাবাসী নয় সারাদেশের জনগণকে রক্ষা করা ও নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কানসাটবাসীর আন্দোলন এবং তাদের ওপর রাষ্ট্রীয় বর্বরতার প্রতিকারের দাবি ইত্যাদি ক্ষেত্রে গণআন্দোলনের হাতিয়ার হিসাবে হরতাল-ধর্মঘট-অবরোধ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি হিসাবে ভূমিকা রেখেছে। হরতাল, ধর্মঘট না থাকলেই যে জনগণের উন্নতি, জাতীয় অগ্রগতি ঘটবে – এ কথার সত্যতা তো আমরা গত ১৬ মাসের অবস্থা থেকে বুঝতে পারিনি। এ সময়ে হরতাল, অবরোধ ছিল না। তাতে কি জনগণের দুর্ভোগের মাত্রা কমেছে, না জনগণের জীবনমানের উন্নতির মানদণ্ডে জাতীয় অগ্রগতি সাধিত হয়েছে?

দুর্নীতির সকল পথ রুদ্ধ করতে হবে

এ কথা বিতর্কের ঊর্ধ্বে যে সাম্রাজ্যবাদ নির্ভর শোষণমূলক পুঁজিবাদী ব্যবস্থা বহাল রেখে দুর্নীতির মূলোচ্ছেদ করা সম্ভব নয়। এখন কথা হল, বর্তমান শোষণমূলক ব্যবস্থা বহাল রেখেই দুর্নীতিবিরোধী অভিযান কতটা কার্যকর করা যায় সরকার সে প্রচেষ্টা চালানোর কথা বলছেন এবং কিছু পদক্ষেপও নেওয়া হয়েছে। কিন্তু শুরু থেকে পক্ষপাতমুক্ত থেকে দুর্নীতিবিরোধী অভিযান পরিচালিত না হওয়ায় এ অভিযানকে বিতর্কের ঊর্ধ্বে রাখা যায়নি। শুরুতে সরকারের পক্ষ থেকে দুর্নীতির যে ভয়াবহ চিত্র হাজির করা হয়েছিল, দেশের মানুষের কাছে তা অবিশ্বাস্য মনে হলেও অবাস্তব মনে হয়নি। মানুষ আশ্বস্ত হয়েছিল এই ভেবে যে এর একটা সত্যিকারের প্রতিকার হবে। কিন্তু পরবর্তীতে দেখা গেল বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সরকারি ঘোষণা এবং আদালতের সামনে হাজির করা তথ্য-প্রমাণাদিতে বিরাট ফাঁক। তাছাড়া একই কাতারে দাঁড়িয়ে থাকা দুর্নীতিবাজদের কাউকে 'ফায়ার' কাউকে 'হায়ার' করা হচ্ছে। দুর্নীতির 'বিচার'-এর পরিবর্তে ব্যক্তি বিশেষকে 'পাচার' করার চেষ্টা চলছে। এ ধরনের বিষয় দুর্নীতিবিরোধী অভিযানের কার্যকারিতাকে দুর্বল করেছে এবং জনমনে সরকারের উদ্দেশ্যকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। এর সাথে আছে 'অনুপার্জিত আয় ভোগ করা যাবে না'– সাংবিধানিক এই বিধি লঙ্ঘন করে যখন ফি'বছর কালোটাকা সাদা করা হয় তখন সংবিধান লঙ্ঘনই শুধু হয় না, দুর্নীতিকেও রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রশ্রয় দেওয়া হয়। এখন আবার দুর্নীতিবিরোধী অভিযানের এ পর্যায়ে ট্রুথকমিশন করে দুর্নীতিবাজদের বিশেষ করে দুর্বৃত্ত সিন্ডিকেট ব্যবসায়ীদের একটা বড় অংশকে রেয়াত দেওয়া হলে তা-ও কি দুর্নীতিবাজদের উৎসাহিত করবে না?

ক্ষমতার ভারসাম্য

পার্লামেন্টারি পদ্ধতির সরকারে প্রধানমন্ত্রী প্রধান নির্বাহী। সে হিসাবে সমস্ত রাষ্ট্রীয়-প্রশাসনিক কাজের সমন্বয় এবং বিধিসম্মত নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার দায়িত্ব তার ওপর বর্তায়। আবার রাষ্ট্রপতি সর্বোচ্চ পদে আসীন থাকায় নির্বাহী কর্তৃত্বকে আইনি-সাংবিধানিক সীমা ও সীমানার মধ্যে রেখে জনমত ও জনপ্রতিনিধিত্বের মধ্যকার দূরত্ব কমানোর অর্থে ভারসাম্য রক্ষার দায়িত্ব তার ওপর ন্যাস্ত থাকে। এক্ষেত্রে যে ভারসাম্যহীনতা বিদ্যমান আছে তা শুধু সাংবিধানিক ও আইনগত দিক থেকেই নয়, গত ৩৭ বছরের রাজনীতির দলীয়করণ ও সামরিকীকরণ প্রক্রিয়ার অশুভ পরিণতি এবং তার ফলে সৃষ্ট সাংস্কৃতিক সংকটের মাঝে নিহিত। তাছাড়া রাষ্ট্রীয় প্রশাসনিক বিন্যাস – কেন্দ্র (রাজধানী), বিভাগ, জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন পর্যন্ত থাকলেও জনপ্রতিনিধিত্বশীল সংস্থা রয়েছে সর্বনিম্ন ইউনিয়ন ও সর্বোচ্চ জাতীয় সংসদ-এ। মধ্যবর্তী সমস্ত স্তর আমলাতান্ত্রিক প্রশাসন কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা পরিচালনার ক্ষেত্রে এর চেয়ে ভারসাম্যহীনতা আর কি হতে পারে? তারপরও জাতীয় সংসদ অর্থাৎ আইন সভার সদস্যরা রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণ ও আইন প্রণয়নের চাইতে নির্বাচনী এলাকাসহ নিজস্ব প্রভাবাধীন এলাকা তৈরির জন্য কথিত উন্নয়ন, তদ্বির বাণিজ্য ও তদারকি কাজে ব্যস্ত থাকে। আবার জনপ্রতিনিধিদের অনাস্থা দিয়ে অপসারণের কোনো ক্ষমতাও ভোটার জনগণের হাতে নেই। অন্যদিকে ইউনিয়ন পর্যায়ের স্থানীয় সংস্থাও আমলাতন্ত্র নির্ভর এবং দলীয়করণকৃত অসুস্থ রাজনীতির শিকার। এছাড়া সংবিধানের ৪৮ (৩), ৭০, ৯৫ (১), ১১৮ (১) ধারাসহ বহু ধরনের অসঙ্গতি রয়েছে। সর্বদিক থেকে সঠিক জনপ্রতিনিধিত্ব ও জবাবদিহিতার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ না করে শুধু রাষ্ট্রপতি আর প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ভাগাভাগির হেরফের করে তেমন ফল আসবে না। এখন ভারসাম্য করতে গিয়ে এমন কোনো সংস্থা বা ব্যবস্থা গ্রহণ করা ঠিক হবে না যা পার্লামেন্টকে পরোক্ষ অধীনতার মধ্যে নিয়ে যাবে কিংবা পার্লামেন্টারি শাসন ব্যবস্থার মূল আদলকে পাল্টে ফেলবে। এটা নতুন সংকটের জন্ম দেবে।

কৃষি ও কৃষক

বাম্পার ফলনের জন্য সরকার এবং জাতির তরফ থেকে প্রধান উপদেষ্টা কৃষক সমাজকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়েছেন। সাথে সাথে সরকারের বিভিন্নমুখী কার্যক্রমের মাধ্যমে কৃষি ও কৃষককে সকল প্রকার সহায়তা দানে দৃঢ় সংকল্প ব্যক্ত করা হয়েছে। কিন্তু এ বিষয়েও সামগ্রীক পরিকল্পনার আলোকে স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী কার্যক্রম, যেমন – ভূমি সংস্কার, সরকারি খাসজমি উদ্ধার ও প্রকৃত ভূমিহীনদের মাঝে বণ্টন, কৃষি ও কৃষিভিত্তিক শিল্পকে প্রাধান্যে রেখে খাদ্যে স্বয়ম্ভরতা ও উদ্বৃত্ত সৃষ্টি, কৃষি গবেষণা, কৃষি ভর্তুকী, খোদ কৃষকের কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য ও কৃষি উপকরণের সুলভ সহজ প্রাপ্তি, কৃষকদের উন্নতমানের কৃষি শিক্ষা ও প্রযুক্তিসহ জাতীয় অর্থনীতির ভিত্তি মজবুত করার ক্ষেত্রে বাজেট বরাদ্দসহ অন্যান্য পদক্ষেপসমূহ স্পষ্ট নয়। আমাদের দেশে খাদ্যসংকট একটা কৃত্রিম সংকট। কারণ আমাদের জমির উর্বরতার নিরিখে খাদ্যঘাটতি বা খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার প্রশ্ন ওঠে না। তারপরও দীর্ঘদিনের চলে আসা ভ্রান্ত নীতির কারণে খাদ্যের হাহাকারে নিপতিত হয়েছে 'সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা' বাংলাদেশ।

এখন কথা হল, খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেও তাতে সাধারণ জনগণের ভাগ্য ফেরেনা যদি বিলি-বণ্টন ব্যবস্থায় গলদ থাকে। স্বাধীনতাত্তোর কালে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের তুলনায় খাদ্য উৎপাদন অনেক বেড়েছে। তারপরও অধিকাংশ মানুষ আগের তুলনায় অধিক খাদ্য নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। বর্তমান অনিয়ন্ত্রিত বাজার ব্যবস্থার সুযোগে ব্যবসায়ীদের নতুন সিন্ডিকেটের কারসাজির ফলে দ্রব্যমূল্য অস্বাভাবিক মাত্রায় বিরাজ করছে। আন্তর্জাতিক বাজারের দোহাই দিয়ে তা ঢাকা যাবে না।

নির্বাচন ও জরুরি অবস্থা

ডিসেম্বর ২০০৮-এর মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠানের যে অঙ্গীকার সরকার এবং নির্বাচন কমিশন করেছে তার যথাযথ বাস্তবায়ন দরকার। কালোটাকা, পেশীশক্তি, ধর্মব্যবসায়ী, ঋণখেলাপি, যুদ্ধাপরাধী, দুর্নীতিবাজ মাফিয়া চক্র ইত্যাদির প্রভাব থেকে নির্বাচনকে মুক্ত রাখতে গণসচেতনামূলক ও প্রশাসনিক তৎপরতার তেমন আলামত পরিলক্ষিত হচ্ছে না। হঠাৎ হঠাৎ করে ধর-পাকড় বা গণগ্রেফতার যা হচ্ছে তার উদ্দেশ্যমুখীনতা নিয়েও প্রশ্ন দেখা দিচ্ছে। প্রধান উপদেষ্টা তার ভাষণে নির্বাচনী প্রচারণার জন্য নিঃসংকোচে এবং মুক্তভাবে রাজনৈতিক কর্মীদের চলাফেরা, সভা অনুষ্ঠান, অন্যান্য পন্থায় প্রচার-প্রচারণা ইত্যাদি কর্মকাণ্ডে নির্বিঘ্নে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার যে প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করেছেন – ওই প্রয়োজনেই জরুরি অবস্থা শিথিল নয়, বরং এখনই

সম্পূর্ণ তুলে নেওয়া প্রয়োজন। তা না হলে ভোটার অর্থাৎ জনগণ মুক্ত পরিবেশে চলাফেরা ও স্বাধীন মত প্রদানের স্বস্তি অনুভব করবে না। চোরের চৌর্যবৃত্তির চেয়ে জনগণের প্রতিকার প্রতিরোধ শক্তি সবসময়ই বেশী – এ আস্থা জনগণের প্রতি রাখতে না পারলে যতই আইনের বেড়া দিয়ে বেষ্টনীর পর বেষ্টনী তৈরি করা হোক না কেন শেষ পর্যন্ত তা টেকেনা এবং শুভ কোনো ফলাফলও বয়ে আনেনা।

জাতীয় ঐকমত্য ও বিদ্যমান রাজনৈতিক ও জনজীবনের সংকট মোকাবেলার জন্য করণীয়

১ ॥ একাত্তরের মৌলচেতনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সংবিধানের ২য়, ৪র্থ, ৫ম, ৭ম এবং ৮ম সংশোধনী বাতিল করা। বিশেষ ক্ষমতা আইন'৭৪, বাংলাদেশ দণ্ড বিধির ৫০৫ (ক) ধারা, ফৌজদারি কার্যবিধির ৯৯ (ক) ধারা, ৫৪ ধারা, ডিএমপি ৮৬ ধারা, সন্ত্রাস দমন অধ্যাদেশ, অর্পিত (শত্রু) সম্পত্তি আইনসহ সকল কালাকানুন বাতিল করা।

(ক) সংবিধানের ১২নং অনুচ্ছেদ পুনঃপ্রবর্তন করা এবং ৩য় ভাগে ২৬ অনুচ্ছেদে বর্ণিত মৌলিক অধিকার এবং অনুচ্ছেদ ১৫ (ক) (খ) (গ) (ঘ), ১৭ [ক], ১৮ (২), ২০ (২), ২৫ (গ) এবং ৩৫ (৩) (৫) ইত্যাদি ধারার সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ শাসনকার্য পরিচালনার অতীত-রীতি কঠোরভাবে বন্ধ করা।

(খ) অগণতান্ত্রিকভাবে প্রণীত 'শ্রম আইন ২০০৬' এবং ঞঈঈ কর্তৃক পেশকৃত সংশোধিত শ্রম অধ্যাদেশ ২০০৮ বাতিল করে আই.এল.ও সনদের সাথে সঙ্গতিবিধান করে শ্রম আইন প্রণয়ন করা। বাজার দরের সাথে সঙ্গতি রেখে ৫ মন চালের সমপরিমাণ মূল্য ন্যূনতম মজুরি ঘোষণা করা।

(গ) সমতল ও পাহাড়ের ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বাসমূহের ভাষা, কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও সম্পত্তির উপর আইনি অধিকারসহ সার্বিক বিকাশের সাংবিধানিক নিশ্চয়তা বিধান করা। সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ও ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বাসমূহের উপর নির্যাতন-নিপীড়ন বন্ধ করা।

(ঘ) আইন করে সম্পত্তিতে নারী-পুরুষের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠাসহ মৌলবাদী-সাম্প্রদায়িক শক্তির চাপে স্থগিতকৃত নারীনীতি বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ এবং সিডও-সনদের পূর্ণ বাস্তবায়ন করে নারী-পুরুষের সকল বৈষম্য বিলোপ করা।

২ ॥ সামরিক স্বৈরশাসনবিরোধী '৯০-এর গণঅভ্যুত্থানের সময় সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের মাধ্যমে প্রণীত ছাত্রসমাজের ১০ দফা, শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদের ৫ দফা, ১৭ কৃষক সংগঠনের ১০ দফা, ঐক্যবদ্ধ নারী সমাজের ১৭ দফাসহ অন্যান্য শ্রেণী-পেশার সংগ্রামী জনগণ কর্তৃক উত্থাপিত দাবিসমূহ আজকের প্রাসঙ্গিকতায় বাস্তবায়ন করা।

(ক) আদর্শহীন, সুবিধাবাদী লুটপাটের রাজনীতির বিপরীতে আদর্শবাদী, প্রগতিশীল, গণতান্ত্রিক, দেশপ্রেমিক রাজনীতির পক্ষে সরকারি-বেসরকারি সকল প্রচারমাধ্যমে ব্যাপক প্রচারাভিযান চালানো।

(খ) ছোটবেলা থেকে আদর্শ-চেতনা গড়ে তোলার পরিপূরক শিক্ষা কার্যক্রম ঢেলে সাজানো। অন্ধত্ব, কুসংস্কার, যুক্তিহীনতার পরিবর্তে বিজ্ঞানমনস্ক ভাবমানস গড়ে তোলার লক্ষ্যে শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তোলা।

(গ) ভোগবাদ ও অপঃসংস্কৃতি বিরোধী সামাজিক আন্দোলন ও সচেতনতা গড়ে তোলা।

(ঘ) রাজনৈতিক দলের তথ্য যা নির্বাচন আয়োজনের সহায়ক হয় ততটুকুর বাইরে এমন শর্তাবলী হাজির করা ঠিক হবে না যা পরবর্তী শাসকদলের হাতে রাজনীতি ও রাজনৈতিক দলকে নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ারে পরিণত হয়।

(ঙ) '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ এবং '৯০-এর স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনসহ জাতীয় রাজনীতিতে জনগণের সকল গণতান্ত্রিক সংগ্রামে সক্রিয় রয়েছে, দুর্নীতিগ্রস্ত দুর্বৃত্তায়িত রাজনীতির প্রভাবমুক্ত এবং এর বিরুদ্ধে সোচ্চার রয়েছে এমন সকল রাজনৈতিক দলের নিবন্ধনের জন্য সহজতর আনুষ্ঠানিক রীতি প্রবর্তন করা।

(চ) গণতান্ত্রিক চেতনা, মূল্যবোধ, সংস্কৃতি ও শক্তি বিকাশের সামনে প্রশাসনিক, আইনগত, প্রাতিষ্ঠানিক ও প্রথাগত সকল বাধা অপসারণ করা।

(ছ) সংবাদপত্র ও প্রচার মাধ্যমের ওপর প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ ও চাপ প্রয়োগ বন্ধ করা।

৩ ॥ দুর্নীতি ও দুর্বৃত্তায়িত রাজনীতির বিপরীতে জনগণের প্রকৃত রাজনীতি গড়ে তোলার স্বার্থে অবিলম্বে জরুরি আইন প্রত্যাহার, জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরিয়ে দেয়া।

৪ ॥ চাল, ডাল ও তেলসহ খাদ্য দ্রব্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণ ও প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা।

(ক) ব্যক্তি মালিকানায় খাদ্যবাণিজ্য বন্ধ করে চাল, ডাল, আটা, তেল ও শিশুখাদ্যের রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য চালু করা।

(খ) অবিলম্বে গ্রাম-শহর সর্বত্র রেশনিং ব্যবস্থা চালু করা।

৫ ॥ দুর্বৃত্তায়িত, দুর্নীতিগ্রস্থ, অধঃপতিত বুর্জোয়া রাজনীতির অবসান ঘটিয়ে রাজনীতির গুণগত উত্তরণের লক্ষ্যে পক্ষপাতহীনভাবে দুর্নীতিবাজদের গ্রেফতার ও বিচার করা। সরকারের দ্বৈত নীতি পরিহার করা।

৬ ॥ সকল নাগরিকের জামিন পাওয়ার ন্যায়সঙ্গত অধিকার নিশ্চিত করা। নিরাপরাধ কেউ যাতে শাস্তি না পায় তা নিশ্চিত করা।

৭ ॥ অবিলম্বে সরকারের পক্ষ থেকে যুদ্ধাপরাধীদের চিহ্নিত করে বিশেষ ট্রাইব্যুনালে বিচার প্রক্রিয়া চালু করা।

৮ ॥ কালোটাকার মালিক, ঋণখেলাপী ও ধর্মব্যবসায়ীদের নির্বাচনে অযোগ্য ঘোষণা করা।

৯ ॥ কালোটাকা, সন্ত্রাস ও সাম্প্রদায়িকতামুক্ত অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের পরিবেশ নিশ্চিত করে ঘোষিত সময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নির্বাচিত সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা।

১০ ॥ নির্বাচন অনুষ্ঠান নিয়ে জনমনে সৃষ্ট আশঙ্কা দূর করতে নির্বাচনের সুনির্দিষ্ট তারিখ ঘোষণাসহ অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের পরিবেশ গড়ে তোলা।

১১ ॥ ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক, নারীসহ সকল শ্রেণী-পেশার সংগঠনের সাথে সংলাপে বসা ও মতামত গ্রহণ করা।

১২ ॥ ভূমিহীন ক্ষেতমজুরদের সারাবছরের কাজ ও খাদ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। কৃষি ফসলের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে হাটে-বাজারে, সরকারি ক্রয়কেন্দ্র খুলে খোদ কৃষকের কাছ থেকে ধানসহ কৃষিপণ্য ক্রয় করা। কৃষি উপকরণের ন্যায্যমূল্য ও সরবরাহ নিশ্চিত করা।